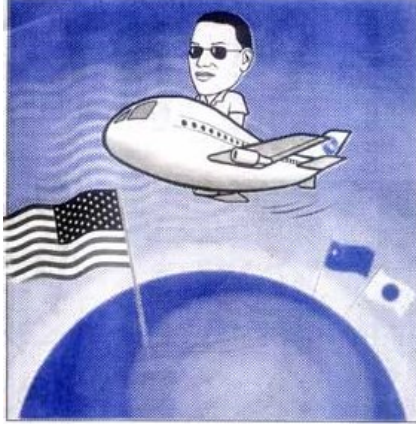


শাম্মীনতার ঊন্থেটা দিষ্ট

অভিজিৎ রায়



(সাপ্তাহিক যায় যায় দিনে ২৪ মে ২০০৫ এ প্রকাশিত)

হেড লাইন

- লঙ্কডুবিবির বিষচক্র
- পশ্চিমের হাওয়া কোন দিকে
- পারমানবিক প্রভাৱণা
- ডিজাইন ও ডিজাইনার
- লঙ্কডুবিতে নৌমন্ত্রীৰ অন্তর্ধান
- রেডিও টেলিভিশনের শক্তি
- আধুনিক ব্রাজিলিয়ান ফুটবলের রূপকার
- যায়যায়দিন-এর পরবর্তী প্রতিযোগিতা
- সেন্স এডুকেশন এবং অশ্লীলতা ভাবনা
- মীর নাছিরের পরাজয়ের কারণ

আমি বিজ্ঞানের লেখক, সাহিত্য কিংবা সামাজিক সমস্যা নিয়ে খুব একটা লিখি না। আইনস্টাইনের বিস্ময় বার্ষিকী কে স্মরণ করে ‘আজি হতে শত বর্ষ আগে’ নামে আমার বিজ্ঞান বিষয়ক একটি প্রবন্ধ অনেকটা পরীক্ষামূলক ভাবেই *যাযাদিতে* পাঠয়েছিলাম যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৫ ই মার্চ সংখ্যায়। বিজ্ঞান বিষয়ে এমনিতেই পাঠক-পাঠিকাদের আগ্রহ থাকে কম, হয়ত সেকারণে অনেক পাঠকেরই দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে, তবে যে প্রবন্ধটি দৃষ্টি এড়ায়নি, কিংবা আরো স্পষ্ট করে বলা যায়, যে প্রবন্ধটিকে ঘিরে পাঠকদের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশী সাড়া পেয়েছি, সেটি কোন বিজ্ঞানের ওপর লেখা প্রবন্ধ নয়, প্রবন্ধটির নাম - ‘অশ্লীলতা নিয়ে আশালীন ভাবনা।’ প্রবন্ধটি যে সপ্তাহটি জুড়ে ইন্টারনেটে যাযাদি সাইটের প্রথম পাতায় ছিল, প্রায় প্রতি দিনই পাঠকদের কাছ থেকে দু-তিনটি করে ইমেইল পেয়েছি। প্রায় প্রত্যেকেই আমার বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করেছেন। দু’একজন যারা করেননি, কিংবা প্রশ্ন করে আনুসন্ধিৎসা মেটাতে চেয়েছেন, তাদের সবাইকেই উত্তর দিতে চেষ্টা করেছি যথাসাধ্য।

যাযাদির ৩ মে তারিখে দেখলাম ‘শালীন ভাবনা’ নামে ইয়াসমিন নাহার শাম্মীর একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে। মিস শাম্মী আমার লেখাটি পড়েছেন আর লেখাটি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন, সেজন্য ধন্যবাদ জানাই। তবে তার বক্তব্যের সাথে আমি একদমই একমত নই। আমি এ নিয়ে আমার কিছু মতামত যাযাদির এই পর্বে তুলে ধরতে চাইছি। তবে কেবল তর্কের খাতিরে তর্ক করবার জন্যই লিখছি না, বরং এ প্রসংগটি নিয়ে একটি সুস্থ আলোচনার পরিবেশ যেন তৈরী হয়, সেটিও কিন্তু আমার প্রত্যাশা। মিস শাম্মী খুব

জোড়ালো ভাবেই যাযাদিকে অনুরোধ করেছেন অবৈধ ও অনৈতিক সম্পর্ককে প্রাধান্য দিয়ে লেখা যেন আর ছাপানো না হয়। এতে নাকি সমাজ অধঃপাতে যাবে! তার মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, কোন সৃষ্টিশীল শিল্প কিংবা সাহিত্য কোন ‘হোলি কাউ’ - নয়, বৈধ-অবৈধ কাম, ক্রোধ, ঘৃণা, ভালবাসা, প্রতিহিংসা, অনৈতিক সম্পর্ক - এগুলো তো সমাজ থেকেই উদ্ভূত। লেখকরা তো আর গায়েবী কোন সত্ত্বা নন, তারা তাদের লেখার উপকরণ খোঁজেন সমাজ থেকেই। সমাজের মধ্যে নিরন্তর ঘটে যাওয়া সমস্যাবলীকে নিরপেক্ষভাবে লিপিবদ্ধ করতে হলে তো কিছু ‘অনৈতিক’ কিংবা ‘অশ্লীল’ ব্যাপার-স্বাপার উঠে আসবেই। সেটাই কি স্বাভাবিক নয়? সমাজ উচ্ছল্নে যাবার নাম করে সাহিত্যের মধ্যে দেওয়ালের পাঁচিল তুলে, কিংবা সাহিত্যরসিকদের চোখে ঠুলি পরিয়ে কি সত্যই সমাজের ভাল করা সম্ভব? আমার সন্দেহ আছে।

শাম্মীর মত করে একটা সময় যে লোকজন ভাবেনি তা নয়। একটা সময় সাহিত্যকে আক্ষরিক অর্থেই ‘পবিত্র’ জ্ঞানে পূজো করা হত। সাহিত্য মানেই ছিল কেবল দেব-দেবীর আরাধনা। শাম্মী যদি প্রাচীন কালের পৌরানিক সাহিত্যগুলো পড়ে থাকেন তাহলে এর ভুরি ভুরি প্রমাণ পাবেন। পবিত্র স্তোত্র, পবিত্র শ্লোক পাতার পর পাতা লিখে, তা পাঠ করে দেব-দেবীকে তুষ্ট করার মধ্যেই যেন লুকিয়েছিল সাহিত্যের সকল উদ্দেশ্য। খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষেরা ছিল ‘ইতর জন’। তাই তাদের সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্না কে সাহিত্যের অন্তর্গত করে ‘পবিত্র’ সাহিত্যকে ‘ইতরামির’ পর্যায়ে নামিয়ে আনতে তখনকার ‘সমাজপতি’দের আপত্তি ছিল প্রবল। একটা সময় পরে বিদ্যাসাগরের মত সাহসী লেখকেরা দেব-দেবীর কাল্পনিক চরিত্রগুলোকে মানুষের পর্যায়ে নামিয়ে আনলেন, স্বর্গীয় মায়া কাটিয়ে নিয়ে আসলেন মাটির কাছাকাছি। রাম, ভীষ্ম, শকুন্তলার মত দেব-দেবীদের মানুষের আদলে চিত্রিত করায় সনাতনপন্থীরা ‘গেল গেল’ রব তুলেছিলেন তখনই। তারা দাবী করেছিলেন এগুলো লিখলে সমাজ উচ্ছল্নে যাবে। সমাজ কিন্তু উচ্ছল্নে যায় নি। বরং যত দিন গেছে সাহিত্যের ওই ‘মানবীয় ধারাটিই’ প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করতে শুরু করেছে সনাতনী ধারণাটির ওপর। পরের দিকের সাহিত্যিকরা যেমন বঙ্কিম, শরৎ চন্দ্র এরা আরো এগিয়ে গিয়ে দেব দেবীকে সরিয়ে মানুষকে নিয়েই সাহিত্য করেছেন, প্রাধান্য দিয়েছেন মানবিক প্রেম-ভালবাসার। তবে সেই ভালবাসা ছিল ‘প্লেটোনিক’। যৌনতাকে সাহিত্যে আনা তো দূরের কথা নামটি পর্যন্ত নেওয়া ছিল পাপ। সাহিত্যের মাধ্যমে ‘পবিত্র প্রেম’ চিত্রিত করাটাই ছিল মূখ্য। আমরা যদি বঙ্কিম, শরতের যুগেই পরে থাকতাম তবে হুমায়ূন আজাদ, তসলিমা, হুমায়ূন আহমেদ, ইমদাদুল হক মিলন, সুনীল, শীর্ষেন্দু, সমরেশ, সৈয়দ শামসুল হকদের মত লেখকদের হয়ত জন্মই হত না। এরা প্রেম ভালবাসা নিয়ে তো এত্তার লিখছেনই, সেই সাথে অলি গলি খুঁজে তুলে আনছেন মানব মানবীর নানা ধরনের বৈচিত্রময় সম্পর্কের বিবরণ - এর মধ্যে সবগুলোই যে শাম্মীর পছন্দনীয় রচনাশীল ‘সুস্থ সম্পর্ক’ তা নয় বরং কোনটা গর্হিত, কোনটা অনৈতিক, কোনটা আবার শাম্মীর ধারণার মত ‘অবৈধ’। জীবনের জটিলতা যত বাড়ছে এই

ধরনের জটিল সম্পর্কের উপাদানও সাহিত্যে বেড়ে চলেছে। এটাই স্বাভাবিক। এতে সমাজ নষ্টও হচ্ছে না, পঁচেও যাচ্ছে না। সমাজ সমাজের মতই আছে।

সমকালীন সাহিত্যিকদের অধিকাংশই মনে করেন, উপন্যাসের মাধ্যমে ভাল-ভাল কথা বলা, আর নৈতিকতার বাণী কপচানো একেবারেই সেকেলে। এ ধরনের ‘নৈতিক উপন্যাস’ এখন আর প্রথম শ্রেণীর কোন সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত নয়। আগে ওগুলো লেখা হত ঈশপের গল্পের মত নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়ার জন্য। যেমন, ইংরেজী ভাষায় প্রথম যখন উপন্যাস লেখা হয়েছিল, তখন লেখকদের লক্ষ্যই ছিল গল্পের মাধ্যমে ‘সতী নারী’ গড়ে তোলা। স্যামুয়েল রিচার্ডসন (১৬৮৯ - ১৭৬১) বলতেন, তিনি গল্পের ছলে নাকি নারীদের ‘সতীত্ব’ শেখাতে চান, তাঁর উপন্যাস হচ্ছে ‘চিনিতে ঢাকা নীতিকথা’; এগুলোর ভেতর দিয়েই নাকি সতী নারী গড়তে চেয়েছেন। বাংলা উপন্যাসেও দেখা গেছে প্রথম দিকে কৃষকান্তের উইল, বিষবৃক্ষ, চোখের বালি লেখা হয়েছে ভাল মানুষ, সুখী পরিবার গড়বার প্রচেষ্টা হিসেবে। ওভাবে কিন্তু ভাল মানুষ পাওয়া যায় নি। মাদাম বোভারি, আনা কারেনিনা এগুলো কোন ভালো মানুষের কাহিনী নয়। বন্ধিম ভেবেছিলেন, বিষবৃক্ষ পড়ার ফলে ঘরে ঘরে অমৃত ফলবে। কিন্তু ঘরে ঘরে অমৃত ফলেনি। আসলে দেখা গেছে, সারা পৃথিবী জুড়ে সে সব উপন্যাসই প্রধান হয়ে উঠেছে যেগুলো গৃহ ভাঙার গল্প, অযাচিত সম্পর্কের গল্প, অবৈধ কামের গল্প, কিংবা বৈচিত্রময় প্রেম ও কামনার গল্প। ‘দেবত্বসুলভ’ মনোভাব, কিংবা ‘সদালাপ’ ধর্মগ্রন্থের জন্য হয়ত ঠিক আছে, কিন্তু সাহিত্যের জন্য কখনই ভাল উপাদান নয়, বরং একঘেয়ে। আজকের দিনের উপন্যাসিকেরা মনে করেন, ইতিবাচক দিক আঁকার চেয়ে বরং নেতিবাচক দিক আঁকা অনেক বেশী মঙ্গলজনক, কারণ এতে করে সমাজের ‘দগদগে ঘা’গুলো স্পষ্ট করে দেখানো যায়, সুন্দর ব্যাণ্ডেজ দিয়ে বেঁধে রাখতে হয় না, কিংবা শাম্মীর মত চোখে ঠুলি পরিয়ে রাখতে হয় না। ফরাসী উপন্যাসিক এমিল জোলা (১৮৪০-১৯০২) কিন্তু বারবারই বলেছেন, তার প্রকৃতিবাদী উপন্যাসের প্রধান কাজ হচ্ছে মানুষের চোখ থেকে ঠুলি সরানো, আর সমাজের, মানুষের পচা ঘাগুলো ব্যাণ্ডেজ খুলে দেখানো, আর তার চিকিৎসা করা। ডঃ হুমায়ুন আজাদও তাই মনে করেন, একটা রুচিশীল ‘আনোয়ারা’র চেয়ে ঘা-ওয়ালা ‘গৃহদাহ’ অনেক বেশী উৎকৃষ্ট। ডঃ আজাদকে থাইল্যান্ড থেকে চিকিৎসা শেষে ফেরার পর তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তার পাক সার জমিন উপন্যাসটি নিয়ে, মূলতঃ সে উপন্যাসের অন্তস্থ ‘বিকৃত’ চরিত্রগুলো নিয়ে। তিনি বলেছিলেন -

‘বিকৃতি কাকে বলে? তথাকথিত সুস্থতা থেকে সত্যে উপনীত হওয়াকে? প্রতিটি মানুষের ভিতরেই নানা রকম বিকার আছে, যদি তাকে বিকার বলি। তোমার ভেতরেও রয়েছে, আমার ভেতরেও রয়েছে। চারপাশে যারা রাজনীতি করছে, তাদের মধ্যেও রয়েছে। সবচেয়ে সাধু ব্যক্তির ভেতরে ঢুকলে দেখা যবে বিকারের পাহাড়।... আমি তো শিশুসুলভ নিষ্পাপ, জনপ্রিয় লেখক নই। আমি জীবনের রূপ, সৌন্দর্য-কদর্য- অসৌন্দর্যের রূপ চিত্রণ করতে চাই। সেটা আমার কবিতায় রয়েছে, উপন্যাসে রয়েছে, প্রবন্ধে রয়েছে।

লাস্পটা এখানে প্রাত্যহিক ব্যাপার, কিন্তু তা লিখলে চরম লস্পটও নিষ্কাম সাধু হয়ে নিন্দা করে! ভন্ডামো আমাদের জাতীয় চরিত্র।’

উদ্ধৃতিটি এখানে দিলাম ডঃ আজাদ বা তার সৃষ্টিকে সমর্থন বা বিরোধিতা করবার জন্য নয়, বরং সমকালীন সাহিত্যিকরা সাহিত্যকে কিভাবে দেখেন তার একটা ধারণা দেওয়ার জন্য। তসলিমার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তসলিমার কবিতা উদ্ধৃত করা মানে তসলিমার সমর্থন নয়, বরং সমকালীন অনেক কবি কি ভাবে ভাবছেন, কিভাবে লিখছেন সেগুলো প্রাসঙ্গিকভাবে দেখানোর জন্য। কেউ হয়ত তার লেখাকে অশ্লীল কিংবা অনৈতিক হিসেবে নিচ্ছেন, কেউবা নিচ্ছেন না। এইটাই ছিল আমার লেখার উপজীব্য - শ্লীল অশ্লীলতার ধারণাটা আসলে আপেক্ষিক। এটা কিন্তু স্রেফ আমার মুখের কথা নয়। এর একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও আছে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন সাহিত্যের পছন্দ-অপছন্দ, রসবোধ, শ্লীলতা-অশ্লীলতা - এগুলো একেক জনের কাছে একেক ভাবে উপস্থাপিত হয় যে কারণে, আর যে কারণে আমরা আনেকসময় ব্যক্তিগত অহংবোধে নিজের সংস্কৃতিকে নিজের পছন্দ-অপছন্দকেই ‘পরম’ বলে ভবে নেই তার জন্য দায়ী হল ‘মীম ফ্যাকটর’ (meme factor)। এই পরিভাষাটি এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সামাজিক-জীববিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্স তার বিখ্যাত বই ‘The Selfish Gene’ এ উল্লেখ করেছেন। আরো বিস্তারিতভাবে সামাজিক দৃষ্টিকোন থেকে ব্যাখ্যা করেছেন সুসান ব্ল্যাকমোর তার ‘The Meme Machine’ বইয়ে। প্রত্যাশা করি যে শাম্মী বই দুটি পড়বেন আর তারপর তার মতামত জানাবেন। আরেকটি ব্যাপার না বললেই নয় যে, শাম্মী হয় আমার লেখার কিছু অংশ বুঝতে পারেনিনি কিংবা ইচ্ছে করেই বিকৃত করেছেন, যখন তিনি বলেছেন আমার নাকি তসলিমার কবিতা অশ্লীল লাগেনি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আর নজরুলের লেখা নাকি আমার কাছে ‘অশ্লীল’ লেগেছে। না, আমার আসলে কারো লেখাই অশ্লীল লাগে নি। কবিতাগুলো প্রত্যেকটাই লেখা হয়েছিল ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে। নজরুল আর রবীন্দ্রনাথের কবিতার আগে সচেতন ভাবেই ‘অশ্লীল’ শব্দটি ব্যবহার করেছিলাম, আর তা করেছিলাম ব্যঙ্গার্থে, আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করবার জন্য নয়। শাম্মী দাবী করেছিলেন আমার লেখাটি অসম্পূর্ণ, আর তাকে পূর্ণতা দিতেই নাকি তিনি কলম তুলে নিয়েছেন। কিন্তু তার লেখাটি বেশ কয়েকবার পরার পরও মনে হয়েছে তিনি সেই মধ্যযুগের সনাতন মানসিকতার আর বন্ধিমীয় নৈতিকতার ‘সোনার শেকলে’ বন্দী। নতুন কিছুই উঠে আসলো না তার লেখা থেকে; যদিও বলেছেন, আমার লেখায় ‘দৃঢ় মনোবলের ঘাটতি ছিল’, কিংবা ‘লেখার ওজন বাড়ানোর জন্য’ নাকি বিভিন্ন উদ্ধৃতি দিয়েছি, কিন্তু তার এই বিচারের স্বপক্ষে কোন ধরনের যুক্তি হাজির করতে তাকে দেখলাম না। তার কথা মত আমার লেখার পূর্ণতা দিতে তিনি সত্যই পেয়েছেন কিনা সে ব্যাপারে কোন মন্তব্য না করে বিচারের ভার না হয় পাঠকদের উপরেই ছেড়ে দেওয়া যাক।

স্পর্শকাতর এ বিষয়টি নিয়ে এটাই আমার শেষ লেখা। আবার প্রবন্ধের শুরুতে ফিরে যাই। বলছিলাম আমি মূলতঃ বিজ্ঞানের লেখক। বিজ্ঞান নিয়ে সাধারণ পাঠকদের জন্য লিখতেই

বেশী সাক্ষন্দবোধ করি। ‘আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী’ নামে আমার একটি বই আঙ্কুর প্রকাশনী প্রকাশ করেছে। পাঠকেরা যারা আমার লেখার সাথে পরিচিত হতে চান, তারা বইটি পড়তে পারেন। ভবিষ্যতে যাযাদির পাতায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে লেখার আশ্রহ রইল।

সিঙ্গাপুর থেকে

৪ মে, ২০০৫

ইমেইলঃ charbak_bd@yahoo.com